ছয় দফাঃ শহীদের রক্তে লেখা

তোফায়েল আহমেদ

প্রতি বছর আমাদের জাতীয় জীবনে সাতই জুন তথা 'ছয় দফা দিবস' ফিরে আসে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা দিনটি পালন করি। এ বছর সাতই জুন তথা ছয় দফা দিবসের ৫৬তম বার্ষিকী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছয় দফা ও সাতই জুন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফা ও সাতই জুনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৬৬-এর এই দিনে মনু মিয়া, মুজিবুল্লাহসহ অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা। পরবর্তীতে '৬৯-এর গণআন্দোলনের সূচনালগ্নে এই ছয় দফা দাড়ি-কমা-সেমিকোলনসমেত এগারো দফায় ধারিত হয়ে, '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা এক দফা তথা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের গভীরে সততই প্রবহমান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার বাইরে অন্য কোনো চিন্তা তাঁর ছিল না। জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বাংলাদেশকে তিনি স্বাধীন করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে সর্বধর্মের, সর্ববর্ণের, সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য তিনি আওয়ামী লীগের দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে। কারো ধর্ম পালনে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অভিপ্রায় থেকেই তিনি জাতির উদ্দেশ্য ছয় দফা কর্মসূচী প্রদান করেছিলেন।

বাংলার গণমানুষ '৬৬-এর সাতই জুন স্বাধিকার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী হরতাল পালন করেছিল। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান এদেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে সংখ্যাগুরু বাঙালি জাতিকে গোলামীর শৃঙ্খলে চিরস্থায়ীভাবে শৃঙ্খলিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। এর বিপরীতে, বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব '৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সম্মিলিত বিরোধী দলসমূহের এক কনভেনশনে বাংলার গণমানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি সম্বলিত বাঙালির 'মুক্তিসনদ' খ্যাত ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবি' উত্থাপন করে তা বিষয়সূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভার সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী 'ছয় দফা দাবি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে ঢাকা বিমান বন্দরে সংবাদ সম্মেলনে এবিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন ও ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে 'ছয় দফা' দলীয় কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ 'ছয় দফা' ঘোষণার পর জনমত সংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধু তাঁর সফরসঙ্গীসহ '৬৬-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের জনসভায় 'ছয় দফা'কে 'নূতন দিগন্তের নূতন মুক্তিসনদ' হিসেবে উল্লেখ করে চট্টগ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'একদিন সমগ্র পাক-ভারতের মধ্যে বৃটিশ সরকারের জবরদস্ত শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলের বীর সন্তানেরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। আমি চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জন্য দাবি আদায়ে সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাসীরা চট্টগ্রামেই প্রথম উড্ডীন করুন।' চট্টগ্রামের জনসভার পর দলের আসন্ন কাউন্সিল সামনে রেখে 'ছয় দফা'র যৌক্তিকতা তুলে ধরতে তিনি একের পর এক জনসভা করেন। এরই অংশ হিসেবে ২৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালির মাইজদি, ওইদিনই বেগমগঞ্জ, ১০ মার্চ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, ১১ মার্চ ময়মনসিংহ সদর ও ১৪ মার্চ সিলেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় জনতার দরবারে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

'ছয় দফা' প্রচার ও প্রকাশের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট 'উপ কমিটি' গঠন এবং তাঁরই নামে 'আমাদের বাঁচার দাবিঃ ছয় দফা কর্মসূচী' শীর্ষক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। একই বছরের মার্চের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখ ছিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। এদিন কাউন্সিল সভায় পুস্তিকাটি বিলি করা হয়। দলের সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গীত হয়। বাঙালীর বাঁচার দাবি 'ছয় দফা'কে উপলক্ষ্য করে '৬৬-এর মার্চে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিনের সেই কাউন্সিল সভায় আগত ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে। 'ছয় দফা'র ভিত্তিতে সংশোধিত দলীয় গঠনতন্ত্রের একটি খসড়াও অনুমোদন করা হয়। 'ছয় দফা' কর্মসূচী প্রদানের সাথে সাথে 'ছয় দফা'র ভিত্তিতে দলীয় গঠনতন্ত্র এবং নেতৃত্ব নির্বাচনে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা পরবর্তীকালে 'ছয় দফা'র চূড়ান্ত পরিণতি এক দফা তথা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ইঙ্গিতবাহী ছিল। 'ছয় দফা কর্মসূচী' দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের মতো অপেক্ষাকৃত তরুণ ছাত্রলীগ নেতৃত্বের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে 'ছয় দফা' এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, বাংলার প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এই পুস্তিকা সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল। 'ছয় দফা' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।' বস্তুত, 'ছয় দফা' ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র তথা অঙ্কুর। কাউন্সিল অধিবেশনের শেষদিন অর্থাৎ ২০ মার্চ চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় দলীয় নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'চরম ত্যাগ স্বীকারের এই বাণী লয়ে আপনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়—ন। পূর্ব পাকিস্তানের

প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের জন্য সবকিছু জেনে-শুনেই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করে নিয়মতান্ত্রিক পথে ছয় দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য এগিয়ে আসছে।'

আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে বাঁক পরিবর্তন। যা '৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন ও '৭১-এর মহত্তর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল। কাউন্সিল সভার সমাপনী জনসভায় বঙ্গবন্ধু মুজিব বলেছিলেন, 'ছয় দফার প্রশ্নে কোনো আপোশ নাই। রাজনীতিতেও কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নাই। নেতৃবৃন্দের ঐক্যের মধ্যেও আওয়ামী লীগ আর আস্থাশীল নয়। নির্দিষ্ট আদর্শ ও সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের ঐক্যেই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ নেতার দল নয়-এ প্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই ছয় দফা আদায় করতে হবে। কোনো হুমকিই ছয় দফা আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ছয় দফা হচ্ছে বাঙালির মুক্তি সনদ।' স্বভাবসুলভ কণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'এই আন্দোলনে রাজপথে যদি আমাদের একলা চলতে হয় চলবো। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করবে বাঙালীর মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।' বঙ্গবন্ধু জানতেন, 'ছয় দফা'ই কেবল বাঙালীর স্বাধিকার তথা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর অখন্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ পাঞ্জাবীরা 'ছয় দফা' বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুরু বাঙালির রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহন ঠেকাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে-যা পরিণামে স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সফলভাবে সমাপ্ত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের পর বঙ্গবন্ধু সারাদেশ চষে বেড়ান। ২৬ মার্চ সন্দ্বীপ এবং ২৭ মার্চ সাতকানিয়ার বিশাল জনসভায় 'ছয় দফা কর্মসূচী' ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন। এরপর উত্তরাঞ্চল সফরে যান '৬৬-এর ৭ এপ্রিল। ওইদিন পাবনা ও নগরবাড়ির জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। একই মাসের ৮ তারিখ বগুড়া, ৯ তারিখ রংপুর, ১০ তারিখ দিনাজপুর, ১১ তারিখ রাজশাহী, ১৪ তারিখ ফরিদপুর, ১৫ তারিখ কুষ্টিয়া, ১৬ তারিখ যশোর এবং ১৭ তারিখ খুলনায় বিশাল সব জনসভায় ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বক্তৃতা করেন। এভাবে সারাদেশে ৩৫ দিনে মোট ৩২টি জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। বিপুল সংখ্যক জনতার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত লাগাতার জনসভায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় 'ছয় দফা'র সপক্ষে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপর নেমে আসে স্বৈরশাসক আইয়ুবের নির্মম গ্রেপ্তার-নির্যাতন। প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুকে প্রত্যেক জেলা থেকে জারীকৃত ওয়ারেন্ট বলে লাগাতার গ্রেফতার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এপ্রিলের ১৭ তারিখ রাত্রি ৪ টায় খুলনায় এক জনসভায় ভাষণদান শেষে ঢাকা ফেরার পথে রমনা থানার জারীকৃত ওয়ারেন্ট অনুযায়ী পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ (৫) ধারা বলে পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। যশোর মহকুমা হাকিমের এজলাস হতে তিনি জামিন পান। সেদিনই রাত ৯টায় সিলেটে গ্রেপ্তার, পুনরায় জামিনের আবেদন এবং ২৩ তারিখ জামিন লাভ। ২৪ এপ্রিল ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার, ২৫ এপ্রিল জামিন। 'ছয় দফা' প্রচারকালে তিন মাসে বঙ্গবন্ধুকে সর্বমোট ৮ বার গ্রেফতার করা হয়। এভাবেই আইয়ুবের দমন নীতি অব্যাহত থাকে। একই বছরের ৮ মে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় ঐতিহাসিক 'মে দিবস' স্মরণে শ্রমিক জনতার এক বিরাট সমাবেশে শ্রমিকরা বঙ্গবন্ধুকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং পাটের মালায় ভূষিত করে। ভাষণদান শেষে রাত ১টায় তিনি যখন বাসায় ফেরেন তখন পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) 'ক' ধারা বলে তাঁকে সহ তাঁর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। 'ছয় দফা' দেওয়াকে অপরাধ গণ্য করে স্বৈরশাসক আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে অভিহিত করে দেশরক্ষা আইনের আওতায় আওয়ামী লীগের উপর অব্যাহত গ্রেপ্তার-নির্যাতন চালায়। সামরিক সরকারের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৩ মে সমগ্র প্রদেশে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। প্রতিবাদ দিবসের জনসভায় 'ছয় দফা'র প্রতি গণমানুষের বিপুল সমর্থন প্রকাশ পায়। হাজার হাজার শ্রমিক এদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে এবং পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় উপস্থিত হয়ে সরকারের দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে। দলের নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে গ্রেফতার করা হলে সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান চৌধুরী অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নেতৃবন্দের গ্রেপ্তার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২০ মে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে 'সাতই জুন' সর্বব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। সাতই জুনের হরতালে সমগ্র পূর্ব বাংলা যেন অগ্নিগর্ভ। বিক্ষুব্ধ মানুষ স্বাধিকার ও বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রলীগের সার্বক্ষণিক কর্মী, ইকবাল হল (বর্তমানে শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি। সর্বজনাব শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, আমীর হোসেন আমু, সৈয়দ মাজহারুল হক বাকী, আব্দুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, নূরে আলম সিদ্দিকীসহ আরো অনেকে-আমরা সেদিন হরতাল কর্মসূচী পালনের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সেদিনের হরতাল কর্মসূচীতে ধর্মঘটী ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে তেজগাঁয় শ্রমিক মনু মিয়া, আদমজীতে মুজিবুল্লাহসহ এগারো জন শহীদ হন এবং প্রায় আটশ' লোককে গ্রেফতার করা হয়। তেজগাঁ শিল্পাঞ্চলে হরতাল সফল করার দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী ও নূরে আলম সিদ্দিকী। তাঁরা সেখানে বক্তৃতা করেন। প্রকৃতপক্ষে সাতই জুন ছিল স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথের আরম্ভস্থল তথা যাত্রাবিন্দু। আর আমরা যারা ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম, আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছিল এদিনটিতেই।

১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬২-এর ১৭ সেপ্টেম্বরের 'শিক্ষা আন্দোলন'; '৬৬-এর ৭ জুন 'ছয় দফা আন্দোলন'; '৬৯-এর ১৭ থেকে ২৪ জানুয়রির 'গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থান'; ৯ ফেব্রুয়ারি ১১-দফা বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে 'শপথ দিবস' পালন; স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তির

দাবীতে ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি লাগাতার সংগ্রাম শেষে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম প্রদান; অতঃপর ২২ ফেব্রুয়ারি সকল রাজবন্দির মুক্তির পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ১০ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে 'মুক্ত মানব শেখ মুজিব'কে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান। পঞ্চাশের দশক থেকে বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্যে গড়ে তোলা সকল আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্রলীগ। এসব মহিমান্বিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ অর্জন করেছিল গণতান্ত্রিক তথা নিয়মতান্ত্রিক আচরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জয় করে নিয়েছিল বাংলার মানুষের হৃদয় আর সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। অতীতে আমাদের সময়ে ছাত্রলীগের সম্মেলন গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতিবছর ২১ মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। তা না হলে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কাছে নেতৃত্ব তুলে দিতে হতো। এটাই ছিল বিধান এবং গঠনতান্ত্রিক বিধি-বিধানের অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। বিধান মোতাবেক '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর আমি ছাত্রলীগের সভাপতি এবং আসম আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে এক বছর পরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২১ মার্চের মধ্যে সম্মেলন করে নূরে আলম সিদ্দিকী এবং শাজাহান সিরাজের কাছে নেতৃত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করে আমাদের কমিটি বিদায় নেই এবং ২২ মার্চ হল ত্যাগ করে গ্রীন রোডে 'চন্দ্রশীলা' নামে একটি বাসা ভাড়া করে আমি এবং রাজ্জাক ভাই বসবাস শুরু করি। আজ অতীতের সেই সোনালী দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই স্মৃতির পাতায় দেখি, সেদিনের ছাত্রলীগ ছিল বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায় তথা 'মুজিবাদর্শ' প্রতিষ্ঠার ভ্যানগার্ড। মূলত বঙ্গবন্ধু মুজিবের নির্দেশে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের নেতৃত্বই সেদিন সারা দেশে সাতই জুনের কর্মসূচি সফলভাবে পালন করে স্বাধিকারের পথে এক অনন্য নজীর স্থাপন করে। আর বাংলার মেহনতী মানুষ আত্মত্যাগের অপার মহিমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীসহ সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রদত্ত 'ছয় দফা'ই হচ্ছে বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ।

'ছয় দফা'কে প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বহু ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু 'ছয় দফা'র প্রতি বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় স্থির-প্রতীজ্ঞাবোধ তাঁকে জনমনে অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত করে। '৬৬-এর ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েও 'ছয় দফা' আন্দোলনকে যখন রোধ করা যাচ্ছিল না, তখন বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে চিরতরে তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য স্বৈরশাসক আইয়ুব খান 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' মামলা দেন। 'ছয় দফা' দাবি আদায়ে এবং বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করতে বাংলার সর্বস্তরের মানুষসহ আমরা যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তারা '৬৯-এর জানুয়ারির ৪ তারিখে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছয়-দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-কলে-কারখানায় ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলশ্রুতিতে এগারো দফা আন্দোলনের সপক্ষে সারাদেশে যে গণজোয়ার তৈরি হয় তাতে দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এমতাবস্থায় শাসকশ্রেণি গণ-আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে আমাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে চিত্রিত করে। তাদের এই অপপ্রয়াসের সমুচিত জবাব দিতে '৬৯-এর ৯ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শপথ দিবসের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু মুজিবের নির্দেশে বলেছিলাম, 'পূর্ব বাংলার মানুষ কোনদিন বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয়নি এবং বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসীও নয়। কারণ তারা সংখ্যায় শতকরা ৫৬ জন। যদি কারো পূর্ব বাংলার সাথে থাকতে আপত্তি থাকে তবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।' নেতার এই নির্দেশ আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেনে চলেছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা চালানোর আগ পর্যন্ত কোনরকম উগ্রতাকে অতি বিপ্লবীপনাকে আমরা প্রশ্রয় দেইনি। নিয়মতন্ত্রের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে আমাদের কখনোই অভিযুক্ত করা যায়নি। আমরা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ন্যায্যতা প্রমাণ করে মুক্তিসংগ্রামী হিসেবেই এগিয়ে গেছি। আর এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সাতই জুনের কর্মসূচি পালনকালে শহিদদের বীরত্বপূর্ণ আত্মদান।

ছয় দফার পক্ষে সাতই জুনের হরতাল এতটাই সর্বব্যাপী ছিল যে, স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এসম্পর্কে প্রতিবেদন মুদ্রণ ও প্রকাশের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছিল। সাতই জুনের সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ও 'ছয় দফা'র পক্ষে জনমত তৈরিতে দৈনিক ইত্তেফাকের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ৬৬-এর ১৬ জুন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২(১) ধারায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার এবং দ্য নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করে। পরে, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের ফলে দৈনিক ইত্তেফাক এবং বাজেয়াপ্তকৃত নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসটি ফেরৎ প্রদানে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়েছিল। 'ছয় দফা' দাবি আদায় ও পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য সাতই জুনে যে সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবিতে আমরা ছয় দফার পক্ষে সংগ্রাম করেছিলাম সেই কর্মসূচির ফলশ্রুতিই হচ্ছে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ। সাতই জুন ছিল এর সূচনা বিন্দু। আজ ভাবতে কত ভালো লাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে শত শহিদের রক্তে লেখা এদিনটি চেতনায় জাতীয় মুক্তির যে অগ্নিশিখার জন্ম দিয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় '৭০-এ জুনের ২ তারিখে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং তাঁরই নির্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করি। আওয়ামী লীগে যোগদানের পর বঙ্গবন্ধু আমাকে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে মনোনয়ন দেন এবং মাত্র সাতাশ বছর এক মাস পনেরো দিন বয়সে আমি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। এরপর '৭১-এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে মুজিব বাহিনীর চার প্রধানের অন্যতম হয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি। স্বাধীনতার পর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৪ জানুয়ারি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় আমাকে তাঁর রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ করেন।

আজ সাতই জুনে অতীতের অনেক স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। বঙ্গবন্ধুর স্নেহে আমার জীবন ধন্য। সাতই জুনের চেতনাবহ এই দিনটি আমার জীবনে অম্লান হয়ে আছে। সাতই জুনে যে সকল শহিদ

ভাইয়েরা তাঁদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, বাংলার মানুষের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে গিয়েছেন, আজ তাঁদের পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তাঁদের অমর প্রাণের বিনিময়ে সংগ্রাম পরম্পরায় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম হয়েছে। শহিদের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে জাতির পিতার সংগ্রামী চেতনার ভিত্তিতে, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা উন্নয়নের নবদিগন্তের সূচনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক সাতই জুন ছিল আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনার প্রারম্ভ বিন্দু। এই দিনটিতে সাতই জুনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর্তব্য বলে মনে করি।

#

লেখকঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি